ঘূর্ণাবর্ত

রাজেশ বসু

অপেক্ষার অবসান। টেব্‌লে ঢলে পড়েছে তরুণী। মধ্যবয়সি পুরুষ দু'টি এগিয়ে এল এবার।

মেয়েটিকে ঢাউস লেদারসোফার নরম আরামে শুইয়ে দিল তারা, বেশ যত্ন করেই। ডানহাতটা অবশ্য একটু ঝুলে রইল সোফার বাইরে।

হালকার উপর ভাল সেজেছে মেয়েটি। ডেনিম কাপরি, সঙ্গে হালকা হলুদ রংয়ের লাইক্রার টপ। পায়ে নামী কোম্পানির ক্যানভাস শু। ঝুলে পড়া হাতটিতে ডিজাইনার ঘড়ি, অন্যটিতে মেটাল ব্রেসলেট। ঘাড় অবধি লম্বা চুল বেশ কার্লি। কানে ছোট-ছোট দু'টি রিং, সোনার বলেই মনে হয়। গলা একদম খালি। হাইটটা একটু কম। পাঁচফিট দু'-আড়াই ইঞ্চি হবে। কমপ্লেকশন এবং ফিগার, দু'টোই ভাল, ফেয়ার অ্যান্ড স্লিম। মুখটিও খুব সুন্দর, ঢলঢলে, পুতুল-পুতুল। তবে একটু বেশিরকম ভারী। মডেলিংয়ে এত কিছুর প্রয়োজন নেই। সানি লিয়নি, কিম কারদাশিয়ান বা কেলি ব্রুক হতে চাইলে, অবশ্য অন্য কথা।

ঘরের তৃতীয় পুরুষটি, সে এগিয়ে এল এবার। সে বয়সে যুবক। তিরিশ অনূর্দ্ধ। পরনে লম্বাঝুল লাল-কালো ডোরাকাটা পাঞ্জাবি। চোখে মোটা ফ্রেমের চশমা। গলায় সোনার চেন। মুখে ক'দিনের না-কামানো দাড়ি-গোঁফ। তার হাতে একটি সিরিঞ্জ। কার্পেটে বসে নিপুণ দক্ষতায় ইঞ্জেকশনের তরলটা পুশ করল সে মেয়েটির হাতে। ব্যথার অনুভূতি নেই। বরং আদুরে স্বরে অস্ফুটে কী একটা বলল যেন সে।

"স্লিপ বেবি স্লিপ," বলে ডালিমগালে আলতো টোকা দিল যুবক। কাজ শেষ। সংবিৎ ফিরতেও কিছু টের পাবে না মেয়েটি। আচরণে তারই সংকেত।

কেবল একটু অস্বস্তি হচ্ছিল কয়েকহাত তফাতে দাঁড়িয়ে থাকা অন্য মেয়েটির। যুবকটির চেয়ে

বয়সে বছর তিনেকের ছোট সে। কপিবুক বিউটি না হলেও, সে-ও বেশ আকর্ষক। আকাশিরং তাঁতের শাড়ির আঁচল হাতের আঙুলে ক্রমাগত পাকাচ্ছিল সে। আসলে যতই হোক, সে নিজেও তো একটি নারী।

কোথাও যেন একটু হলেও খারাপ লাগছিল তার। নিজেকে বোঝাচ্ছিল সে, যা করছে টিকে থাকার জন্যেই করছে। জাস্ট স্ট্রাগল ফর এগ্‌জিসটেন্স, তাবড় বিজ্ঞানীরাই তো সেকথা বলেছেন।

তা ছাড়া, সত্যি বলতে এই অস্বস্তিটাও মনের একদম গভীরতম প্রদেশে। বাইরের স্তরে বরং একটা কঠিন আনন্দ তার। এইসব বড়লোকের বিটিদের এমন হওয়াই উচিত। পকেটে মাল্লু থাকলেই ভাবে, পৃথিবীটা হাতের মুঠোয় পুরে ফেলবে। এই আষাঢ়ে বিশ্বাসের ফানুসটা মাঝে-মধ্যে ফুটো করে দেওয়া প্রয়োজন। এমন সব চিন্তায় নিজের কাছে যুক্তি খুঁজছিল সে।

"হোয়াট আ পারফ্‌ম্যান্স!" পিছন থেকে তার পিঠের খোলা অংশে টোকা দিয়েছে যুবকটি।

"মেনশন নট।"

"অ্যাক্টিংয়ে নেমেই যাও এবার। আমার অনেক যোগাযোগ আছে। বলো তো..."

"হুম, সে তো দেখতেই পাচ্ছি," যুবতী বলল চোখ টিপে। যদিও একটি ঢোকও গিলল নিঃশব্দে। স্বভাবসিদ্ধ একপেশের পরিবর্তে দু'গালেই হাসল যুবক। হাতে টাকা এসে গিয়েছে। গুনে নিচ্ছে দ্রুত। পুরো বিন্দাস মুড এখন তার। কিছুক্ষণ আগেও যে একটা হড়কা যন্ত্রণায় ধরাশায়ী হতে যাচ্ছিল, সে অভিজ্ঞতাও বিস্মৃত এখন। নাভির অন্তঃস্থল থেকে আচমকা একটা তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা উঠে এসে ছড়িয়ে পড়ছিল তার তলপেটের সমস্ত গ্রন্থিতে। বরাতজোরে তেমন কিছু হয়নি। যেমন এসেছিল, তেমনই প্রস্থান করেছিল ব্যথার বান।

যাই হোক, এবার তাদেরও প্রস্থানের সময়। তাদের অর্থে যুবক এবং যুবতীর। মধ্যবয়সি পুঙ্গব দু'জন স্কিন-টেস্টের পরিবর্তে স্কিন-টেস্ট নেবে অচেতন তরুণীটির। কাজ শেষে সিগন্যাল দেবে তারা। ফিরে আসবে যুবক এবং যুবতী। স্কিন-টেস্টাররা কেটে পড়বে। তারপর টেবলের সব এগজ়টিক খাদ্যদ্রব্যাদি সাফসুতরো করে মেয়েটির পাশে তারাও শুয়ে পড়বে। ভান করবে ঝিমিয়ে থাকার। জ্ঞান ফিরতে কিছুই জানবে না মেয়েটি। পেনকিলারের যা অ্যাডভান্স ডোজ দেওয়া হয়েছে, অন্তত ক'দিনের জন্যে কোনও ব্যথা-বেদনার রেশ থাকবে না তার। খুব বেশি হলে ভিলেন হবে অর্ডার দিয়ে আনানো মধ্যাহ্নভোজের ওইসব খাদ্যসমূহ। ওইসব খেয়েই না শরীর ম্যাজম্যাজিয়ে এমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল সকলে।

॥১॥

সকাল ছ'টা ১৯ ডিসেম্বর

আজকাল প্রায়ই এমন হয় বিধুর। দু'পাতা একটু বুজেছে কি বোজেনি, অদ্ভুত সব স্বপ্ন এসে জোটে দু'চোখের পাতায়। অবশ্য মাথাতেও বলা চলে। চোখ খুলে তো আর স্বপ্ন দেখা হয় না। মস্তিকের অজ্ঞাত কোনও প্রকোষ্ঠে অদ্ভুত সব দৃশ্যের কেলাইডোস্কোপিক খেলা চলতে থাকে। যতসব আজগুবি উদ্ভট দৃশ্য। মাথামুণ্ডু কিছু নেই। চেতন জগতের সঙ্গে কোনও মিল নেই সে স্বপ্নের। আজও ঠিক তাই। অনেকদিন পর নীল ডায়েরিটা নিয়ে বসেছিল সে। উদ্ভট যা সব এসেছে মাথায়, লিখে গিয়েছে ননস্টপ। শেষে একসময় ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

চোখ বুজতেই দৃশ্যপট বদলে গেল। আদিগন্ত সবুজ মাঝখান দিয়ে চকচকে সর্পিল রাস্তা। সেই মসৃণ রাস্তা দিয়ে তিরবেগে ছুটে চলেছে সে। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত গাড়ির নিভৃত আরামে আসীন সে। সবচেয়ে বড় কথা গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে সে বসেনি। ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে আছে আয়েস করে। বড়-বড় সাহেবসুবোরা যেমন বসে থাকে।

সঙ্গে আরও যেন কারা আছে। তাদের মুখ দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু চিনতে পারছে না। হঠাৎ গাড়ি থামল। চালক নেমেছে গাড়ি থেকে। কোথা থেকে এক ঝাঁকা মুরগি জোগাড় করে এনেছে। সাদা ধবধপে গোলাপি ঝুঁটি ব্রয়লার মুরগি সব। পাগুলো দড়ি দিয়ে বাঁধা। গাড়ির ভিতরের লোকগুলিও এবার নামল। চালকের হাত থেকে একটি-একটি করে মুরগি তারা হাতে নিল। তারপর অবলীলাক্রমে ঝকঝকে দাঁতের সারি বের করে মুরগিগুলোর ছাল ছাড়াতে শুরু করে দিল। মুরগিগুলো চেঁচাচ্ছে। মৃত্যু যন্ত্রণায় চিলচিৎকার করছে। ডানা ঝাপটাচ্ছে। কিন্তু লোকগুলির কোনও প্রতিক্রিয়া, তাপ-উত্তাপ নেই। কী অনায়াস ভঙ্গি!

বিধু গাড়িতেই বসেছিল, নামেনি। ভয়ানক অস্বস্তি হচ্ছিল তার। এমনসময় কে একজন জানালা দিয়ে তার দিকেও একটি মুরগি বাড়িয়ে দিল। বুক কেঁপে উঠল তার, মাথা দুলে উঠল, গা গুলিয়ে উঠল। গাড়ির উলটো দিকের দরজা খুলে সবুজ মাঠের দিকে দৌড় দিল সে। পিছনে হেসে উঠল সবাই। হতভাগার এই জন্যেই কিসস্যু হল না। একদম অপদার্থ। নিষ্কর্মা কোথাকার!

কথাগুলো মরমে লাগলেও, ঠিক কীভাবে প্রতিবাদ করতে হবে বুঝতে পারল না বিধু। কিছুদূর ছুটে দাঁড়িয়ে পড়ল থমকে। এমন সময় কে যেন মৃদু ঠেলা দিল পিঠে। সঙ্গে রিনঝিন কণ্ঠস্বর, "ছি ছি! এই তুমি পুরুষমানুষ! পালিয়ে বেড়াচ্ছ? রুখে দাঁড়ানোর হিম্মত নেই?" চমকে পিছনে তাকাতে ছেড়ে দেওয়া ইলাস্টিকের মতো গুটিয়ে গেল বিধু। একটি মেয়ে। বিরাজসুন্দরী বালিকা বিদ্যালয়ের জোড়াবিনুনি করা সবুজ শাড়ি পরা কিশোরী নয় কিংবা কাছারিবাজারের অফিসমুখী থলথলে মহিলাগুলোর মতো তো নাই-ই। চড়া মেকআপ করা গায়ে-মুখে রংমাখা সিনেমার নায়িকাও না। কুমোরপাড়ার মাটির তৈরি নিটোল কোনও প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা নারী। সোনালি রোদ পিছলে যাচ্ছে তার শরীরে পড়ে। গায়ে কেবল একখানা ডুরে হলুদ শাড়ি। মেঠো মেয়েদের মতোই পড়েছে, হাঁটুর উপরে। কোঁকড়া কালো চুল এলিয়ে পড়েছে পিঠের উপর। শাড়ির শক্ত বাঁধুনিতে যৌবনচিহ্ন বড় প্রকট। সর্বাঙ্গে যেন ঝিঁঝি ডেকে উঠল বিধুর। ইন্দ্রিয়গুলো সব নেচে উঠল। মেয়েটি ওর খুব চেনা। কোথায় যেন দেখেছে, কোথায়-কোথায়? মনে করতে পারছে না। কিন্তু খুব চেনা। এমন পিচ্ছিল ত্বক, এমন ভরাট যৌবন আর এমন শান্ত অথচ ইঙ্গিতময়ী চোখের গভীর দৃষ্টি! এ নারী তার ভীষণ পরিচিত। চেতনাবধি এই নারীটিকেই সে

কথাগুলো মরমে লাগলেও, ঠিক কীভাবে প্রতিবাদ করতে হবে বুঝতে পারল না বিধু। কিছুদূর ছুটে দাঁড়িয়ে পড়ল থমকে। এমন সময় কে যেন মৃদু ঠেলা দিল পিঠে। সঙ্গে রিনঝিন কণ্ঠস্বর, "ছি ছি! এই তুমি পুরুষমানুষ!

যেন চেয়ে ফিরছে।
বিশ্বচরাচর ঝাপসা হয়ে গেল বিধুর। সব অপমান নিমেষে বায়বীয়। বিধু এগিয়ে গেল মেয়েটির দিকে। কিন্তু তার পিঠে যেন অদৃশ্য দু'টি পাখা। প্রজাপতির মতো পিছলে গেল সে। বিধু ছুটল পিছন-পিছন।

ঠিক এমন সময়ে মোবাইলে কথা বলতে-বলতে চার্জ ফুরিয়ে ফোন অফ হয়ে যাওয়ার মতো ঘুমটা ভেঙে গেল।
লে ছক্কা! কোথায় সেই উদ্ভিন্নযৌবনা সুন্দরী! এ তো কঙ্কিদা। সুড়সুড়ি দিচ্ছে কানের পাশে।
"ভোর হয়েছে। দোর খুলেছে। রাকাপতির ওঠা হোক এবার," বিধুর কোঁকড়া চুলগুলো বেশ করে ঘেঁটে দিয়ে বলল কঙ্কিদা।
কম্বলের ভিতর থেকে দু'হাত বের করে আড়মোড়া ভাঙল বিধু। উঠতে ইচ্ছে করছে না। স্বপ্নের দৃশ্যগুলো এখনও মাথার ভিতর বুড়বুড়ি কাটছে। চোখ দু'টোও আঠার মতো লেপটে আছে। আবার ঘুমিয়ে পড়লে হয়। স্বপ্নসুন্দরীটি ফিরেও আসতে পারে। এমন হয়েছেও অনেকবার। ঘুম ভেঙে গিয়ে আবার সেই স্বপ্নই দেখেছে সে। কিন্তু এখন তা সম্ভব না। কঙ্কিদা তাকে উঠিয়ে ছাড়বে। কম্বল ধরে টানাটানি শুরু করেছে এবার। মাথার পিছনের জানালাটাও খুলে দিয়েছে কখন হাট করে। ডিসেম্বর মাস, শীতও পড়েছে জব্বর। এর মধ্যে কয়েকদিন ধরে নিয়ম করে অসময়ে বৃষ্টিও হচ্ছে রোজ, ঠান্ডাটা বাড়িয়ে দিয়েছে বেশ। হাফসোয়েটার পরে শুয়েছিল বিধু, কম্বল সরে যেতে ঠান্ডার কামড়টা বিঁধছে শরীরে। উঠেই পড়ল ও। কঙ্কিদার উপর রাগ করতেও পারে না। খর্বকায় এই মানুষটি তার সব। এই মানুষটি না থাকলে খড়কুটোর মতো ভেসে বেড়াতে হত তাকে। কঙ্কিদা বলল, "নীলাঞ্জন দেব দু'বার ফোন করেছে। প্রথমটা ধরার আগেই কেটে গেল। সেকেন্ডবার ধরতে বলল, আধঘণ্টার মধ্যে ওর ডেরায় পৌঁছে যাস যেন। জরুরি দরকার।"
সক্কাল-সক্কাল মেজাজ খারাপ হয়ে গেল বিধুর। বিরক্তও হল নিজের উপর। কাল মাথার মধ্যে যেন অজস্র প্রজাপতি উড়ছিল। মগজ থেকে বেরিয়ে হাতের কলমের ডগায় উড়ে বসছিল সেগুলো। ফোনটা অন-ই ছিল, সাধারণত ফোন বন্ধ করেই শোয় ও। লাইনটা পেয়ে গেল লোকটা। এখন এড়িয়ে যাওয়া মুশকিল। কঙ্কিদা যদি বুদ্ধি করে না ধরত! এই নীলাঞ্জন লোকটাকে একদম পছন্দ করে না বিধু। কাছারিবাজারের চারতলায় যে শুল্ক দফতরের অফিসটা হয়েছে, সেখানে চাকরি করে। হাবভাব দেখে বড় কিছু সাহেব বলেই মনে হয়।
বিধুর সঙ্গে পরিচয় সুরেশ সাহার ট্রান্সপোর্ট এজেন্সি মারফত। এজেন্সি থেকে বারো মাসের বরাতে একটা গাড়ি ভাড়া নিয়েছিল লোকটার অফিস। বিধু তখন সাহার এজেন্সিতে ড্রাইভার ছিল। যদিও অফিসের জন্য গাড়িটা থোড়াই ব্যবহার করত নীলাঞ্জন দেব। নিজের ব্যক্তিগত কাজেই খাটাত বিধুকে। সে এক ঝক্কির কাজ। নির্দিষ্ট কোনও সময় নেই, সকাল থেকে শুরু করে রাত আটটা-ন'টা, যখন খুশি ফোন করে ডাকত লোকটা। সঙ্গে যত রাজ্যের ফালতু কাজ, বাজার করা, টেলিফোনের বিল দেওয়া, এ ছাড়াও ফি শনি-রবিবার অফিস ছুটির দিনে লং-ড্রাইভে বেরনো তো আছেই। সবচেয়ে কষ্ট হত মিনারেল ওয়াটারের ডাব্বাগুলো ঘাড়ে করে দোতলায় নিয়ে উঠতে। ক'মাস ফোকটে খাটিয়ে মেরেছে লোকটা। তবে লোকটার বউটা কিন্তু একদম অন্যরকম ছিল। স্বামীর মতো অত সাহেবগিরি দেখাত না। বিধুকে তুমি করে কথা বলত। বর তো বাপের বয়সি লোককেও তুই করে ডাকে। লোকটা কলকাতায় গেলে মাঝে-মধ্যে ডাকত বিধুকে। মল-টল বা বিউটি পার্লার নয়, এমনই ঘুরে-বেড়াতে চাইত। সত্যি বলতে, বিধুর সঙ্গে একটু ভাবও হয়েছিল। কাজটা ছেড়ে দেওয়ার পর আর তেমন দেখা হয় না।
নীলাঞ্জন দেব অবশ্য বলেছিল, "আমার গাড়িটা চালা। অ্যাম্বুলেন্স-ট্যাম্বুলেন্স কেউ চালায় নাকি! রোগী নিয়ে দৌড়াদৌড়ি।"
অবশ্যই আর মুরগি হয়নি বিধু। আসলে গতবছর একটা গাড়ি কিনেছে লোকটা। কিন্তু মোটরট্রেনিং স্কুলে ভর্তি হল না। বিধুকে পাশে বসিয়ে শেখাতে হত। সে কী টেনশন গিয়েছে! কতবার বলেছে বিধু, "স্যার, ট্রেনিং-ইস্কুলে যান। একমাসে শিখিয়ে দেবে। তা ছাড়া, ওদের গাড়িতে ড্রাইভারের পাশে যে বসে, তার পায়েও একসেট ক্লাচ আর ব্রেক প্যাডেল থাকে। আপনি সাহস করে চালাতে পারবেন। গাড়ি বেসামাল হওয়ার আগেই ট্রেনার থামিয়ে দেবে।"
কিন্তু সে শুনলে তো! বিধু বোঝে না কারণটা কী? ট্রেনিংস্কুলকে তিন হাজার টাকা দিতে আপত্তি নাকি স্রেফ মাতব্বরি? কিপটেমিও বলা যায় না, বিনা টেস্টে লাইসেন্স বের করতে ওর চেয়েও বেশি টাকা খরচ করেছে লোকটা।
"কী ভাবছিস এত?" দু'হাতে ভর দিয়ে খাটে উঠল কঙ্কিদা। বসেছে বিধুর গা ঘেঁসে।
"বলতে পারতে আমি নেই। শহরের বাইরে গিয়েছি কাজ নিয়ে," মুখ ভেটকে বলল বিধু।
"পারতাম। কিন্তু তোর কথা ভেবেই বলিনি। আসলে গতকালই খবরটা পেয়েছি। তোকে বলা হয়নি। নীলাঞ্জন দেবের অফিসে বারো না আঠারো মাসের চুক্তিতে কিছু ক্যাজুয়াল লোক নেবে। চান্সটা নিবি না? তোর সঙ্গে যখন লোকটার ভাল খাপ আছে। একবার তেল মেরে দেখতে দোষ কি? সবচেয়ে বড় কথা লোকটা নিজে থেকেই যখন তোকে ডাকছে। ফোকটে কম তো খাটায়নি তোকে, এখন তুইও একটা চান্স নে, দ্যাখ না কী বলে। দরকার হলে একটু লেবার দিলিই না হয়।"
বিধু কী বলবে ভেবে পেল না। বুকের ভিতর সিক্সটি সিক্স ভালভের ইঞ্জিন স্টার্ট নিয়েছে। কঙ্কিদা কোথা থেকে সব খবর পায় কে জানে! একটা ভাল চাকরি মানে অনেক কিছু। আকাঙ্ক্ষিত নারী, নিরাপত্তা। তা ছাড়া, নিজের জন্য কিছু সময়, যে সময়টা ওর বিশেষ দরকার। মনটা হঠাৎই হার্ডপাম্প দেওয়া গাড়ির চাকার মতো লাফাতে লাগল। স্বপ্নে দেখা সেই মেয়েটি অসংখ্য বুদবুদ হয়ে ভাসতে শুরু করে দিল চোখের সামনে। পারবে কি বিধু ওই বুদবুদগুলোকে ধরতে? জানে না ও।
"অত ভাবার কী আছে?" বিধুর পিঠে আলতো চাপড় মেরে বলল কঙ্কিদা, "একটু প্র্যাকটিক্যাল হ বাপ। চোরাবালির উপর দাঁড়িয়ে আছি আমরা। পছন্দ-অপছন্দ, রাগ-অভিমান ওইসব নখরা আমাদের মানায় না। সুযোগ এসেছে ফিল্ডে নেমে যা। এ যুগে পিআরটাই আসল। নিজের ক্যালিতে ক'টা লোক বেরচ্ছে? তেলটাই সব।"
বিধু মন ঠিক করে নিয়েছে যাবে সে। খাট থেকে নেমে পড়ল, "ঠিক আছে, বলছ যখন ঘুরেই আসি। একবার ফোন করে নেব কি?"
"দরকার নেই। স্ট্রেট চলে যা। এদিকটা আমি সামলে নেব।"
"কোথায় আর যাবে ভাই? সব রাস্তাই বন্ধ হতে চলেছে। খবরে কী বলছে শুনেছ?" পাশের ঘর থেকে ছ'ফিটের ল্যাগবেগে শরীরটা নিয়ে তড়বড়িয়ে ঢুকেছে মিথিলেশ। এই দু'টি ঘরের মাঝে পাল্লাহীন একফালি প্রবেশপথ, আসা-যাওয়া চলে দু'তরফেই। মিথিলেশ এই উপশম নার্সিংহোমের সিকিউরিটি কাম কেয়ারটেকার। তোবড়ানো চোয়ালে কাঠবিড়ালির লেজের মতো মস্ত গোঁফজোড়া। তিনকুড়ি বয়স হলে কী হবে, এমনিতে ভারী ছেলেমানুষ সে। টিভি দেখতে ভীষণ ভালবাসে। ফেভারিট প্রোগ্রাম হল খবর। রোজ ভোরবেলা ঘুম ভাঙতেই আগে চোদ্দ ইঞ্চির সেকেন্ডহ্যান্ড কালার টিভিটা অন করে দেয়।

ছবি : কুণাল বর্মণ